মেঘদূতের ব্যাখ্যা

শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের লক্ষণই এই যে, তাহা কখনও পুরাতন হয় না। যুগে যুগে সহৃদয় পাঠকের চিত্তে তাহা নব নব ভাব ও রসের উদ্রেক করিয়া থাকে। বিভিন্ন মনীষিগণ তাহার নূতন নূতন অর্থ ও অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন। জগতের মূল-প্রকৃতির রূপ ও অভিব্যক্তির যেমন অন্ত নাই, তেমনই মহাকবিবাণীর দ্যোতনাও সীমাহীন ও অপরিচ্ছেদ্য। মহাকবি শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' 'কিং লীয়র' প্রভৃতি নাটকের কত শত ব্যাখ্যাই-না টীকাকারগণ প্রচার করিয়াছেন। তবুও মনে হয় যে, উহার মূল অভিপ্রায়টি যেন এখনও আমাদের বুদ্ধির পরিধিকে অতিক্রম করিয়াই রহিয়াছে। অনেক সময় সমালোচকগণের ব্যাখ্যা যে কবির মূল সৃষ্টি-প্রেরণার অনুযায়ী হইয়াছে, তাহা নহে। বরং এমনও দেখা যায় যে, কবি সৃষ্টিক্ষণে যে বিষয় চিন্তাও করেন নাই, সমালোচক তাঁহাকেই কাব্যে প্রকৃত ব্যাখ্যা রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে শেক্সপীয়রের নাট্যকলার অন্যতম প্রধান সমালোচক ব্র্যাডলি কর্তৃক প্রচারিত 'কিং লীয়র' নাটকের সমালোচনার প্রতি নিম্নোদ্ধৃত ব্যঙ্গোক্তিটি স্মরণীয়—

I dreamt last night that Shakespeare's ghost
Sat for a Civil Service post.
The English papers of the year
Contained a question on King Lear.
Which Shakespeare answered very badly
Because he hadn't studied Bradley.

কবিই যে অনেক সময় তাঁহার সৃষ্টিমুহূর্তের মূল প্রেরণাটি পরবর্তী ক্ষণে যথাযথ-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, এমনও নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শাজাহান' কবিতার কয়েকটি দুরূহ পংক্তির' ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক কবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন—

"কবিতা লিখেছি বলেই যে তার মানে সম্পূর্ণ বুঝেছি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই। মন থেকে কথাগুলো যখন সদ্য উৎসারিত হচ্ছিল, তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা মানের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্তর্গামীর কাজ সারা হতেই সে দৌড় দিয়েছে। এখন বাইরে থেকে আমাকে মানে ভেবে বের করতে

Scanned by CamScanner

হবে— সেই বাইরের দেউড়িতে যেমন আমি আছি, তেমনি তুমিও আছ এবং আরও দশ জন আছে, তাদের মধ্যে মতান্তর নিয়ে সর্বদাই হট্টগোল বেধে যায়। সেই গোলমালের মধ্যে আমার ব্যাখ্যাটি যোগ করে দিচ্ছি, যদি সন্তোষজনক না মনে কর, তোমার বুদ্ধি খাটাও, আমার আপত্তি করবার অধিকার নেই।"[১]

সুতরাং শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম শুধু একটি মাত্র নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিয়াই চরিতার্থ হয় না। তাহার চতুষ্পার্শে একটি অনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনার পরিমণ্ডল রচিত হইয়া থাকে, বিভিন্ন রসিকজনের বিচিত্র ব্যাখ্যা সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে ভিড় করিয়া থাকে— কবিসম্মত অর্থ সেই অনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত অন্যতম ব্যাখ্যা মাত্র। সব সময় সহৃদয় পাঠকের চিত্ত যে তাহাতেই সায় দিবে, এমন নাও হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সমালোচক ব্র্যাডলি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেমনই সারবান্ তেমনই সহৃদয়ের অনুভববেদ্য—

"About the best poetry, and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all. He said what he meant, but his meaning seems to beckon away beyond itself, or rather to expand into something boundless which is only focussed in it; something also which, we feel, would satisfy not only the imagination but the whole of us..."[২]

অতএব, জগতের যেসকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি, সেগুলির মধ্যে সহৃদয় পাঠক কেবল কল্পনার নবীনতা, ব্যাপকতা অথবা ভাব ও ভাষার বিশিষ্ট বিন্যাস ও মাধুর্য—এইটুকু মাত্রই সন্ধান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না; তাহারা উহাদের মধ্যে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব, কবিজীবনের কোনো অজ্ঞাত ঘটনা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য প্রভৃতির অন্বেষণও করিয়া থাকেন। হয়তো নিছক সাহিত্য-সমালোচনারূপে, অথবা রসদৃষ্টিসম্মত ব্যাখ্যারূপে তাহার কোনো গুরুত্ব নাও থাকিতে পারে; কিন্তু স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের এই-জাতীয় বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যা সমুদিতভাবে পাঠকের কাব্যরসাস্বাদকে গভীরতর ও সমৃদ্ধতর করিয়া তুলে, যাহা কোনো একটি বিশেষ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া চলিলে সম্ভবপর হয় না।

মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত'ও এই জাতীয় একখানি কাব্য। নানা সুরসিক বিদ্বজ্জন ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে

এই কাব্য অধ্যয়ন করিয়াছেন; দার্শনিক ইহার মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়াছেন; মরমী ইহার প্রতিটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে যেন নিজেরই একান্ত নিজস্ব অনুভূতির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন; আবার, যিনি নিছক কাব্যরসপিপাসু, তিনি শুধু এই খণ্ডকাব্যের অপরূপ ভাষাশ্রিত ও বর্ণনার বিচিত্র লীলা দর্শন করিয়াই বিশুদ্ধ কাব্যসৌন্দর্যের এই অতুলনীয় প্রকাশের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন। হয়তো শেষোক্ত সহৃদয়ের চিত্তাবস্থাই নিছক কাব্যসমালোচনার দিক হইতে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাও যে 'মেঘদূত' কাব্যের পরিপূর্ণ আস্বাদনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংযোজন, সে বিষয়েও কোনো মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে 'মেঘদূতে'র বিভিন্নমুখী কয়েকটি ব্যাখ্যার আলোচনা করাই উদ্দেশ্য—সহৃদয় পাঠকগণ ইহাদের সারবত্তা নিজ নিজ রুচি অনুসারে বিচার করিয়া দেখিবেন।

২

পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ

মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অধিকাংশ সমালোচকই একটি সাধারণ বিভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই বিভ্রমের জন্য যে তাঁহারা নিজেরাই দায়ী, তাহা বলিতে পারি না। এই বিভ্রমসৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের দায়িত্ব সমধিক। তিনিই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম টীকাকার যিনি কালিদাসের এই অখণ্ড শিল্পকর্মকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া অর্বাচীন পাঠকসম্প্রদায়ের চিত্তমোহ সংঘটিত করিয়াছেন। 'পূর্বমেঘ' এবং 'উত্তরমেঘ' রূপে মেঘদূতের বিভাগ কালিদাসের কবিকল্পনার মধ্যে একেবারেই স্থান পায় নাই— ইহা যে অন্যান্য একাধিক টীকা-কারগণের সাক্ষ্য হইতেই প্রমাণিত হয় তাহা নয়, মেঘদূতের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক।[৪] মেঘদূতের ত্রয়োদশ শ্লোকে যক্ষ মেঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।

"হে মেঘ! তুমি প্রথমে আমার কাছে তোমার যাত্রার অনুকূল পথের বিবরণ শ্রবণ করো। পরে আমার শ্রোত্রসায়ন বার্তা শুনিও।"

সুতরাং 'মেঘদূতে'র দুইটি প্রধান বিষয়বস্তু— একটি, অলকাগামী মার্গের বর্ণনা; এবং অপরটি, বিরহিণী যক্ষপত্নীর উদ্দেশে যক্ষের বার্তা। খুব সম্ভব মল্লিনাথ এই

Scanned by CamScanner

দুইটি বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়াই মেঘদূতকে দুই অর্ধে ভাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, মল্লিনাথ-পরিকল্পিত বিভাগ যে খুব যুক্তিসংগত হয় নাই, তাহা একটু প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। 'উত্তরমেঘে'র ৪০শ শ্লোক পর্যন্ত অলকাপুরী, যক্ষের বাসভবন ও যক্ষপত্নীর বর্ণনা। অতঃপর কুশলপ্রশ্নের পর ৪১শ শ্লোক হইতে যক্ষের সন্দেশবাক্য আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং মল্লিনাথের 'পূর্বমেঘ' এবং 'উত্তরমেঘ'-রূপে বিভাগকল্পনা এবং 'উত্তরমেঘে'র প্রারম্ভ নির্ণয় যে একেবারেই অযৌক্তিক, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আধুনিক যুগে কালিদাস-রসিক অধিকাংশ বিদ্বজ্জনই কিন্তু 'মেঘদূতে'র এই বিভাগকে অভ্রান্ত ও কবিকল্পিত, অতএব মৌলিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা 'মেঘদূতে'র যে-সকল তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট ভাবুকতা ও রসিকতার পরিচয় আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সকলের মূল ভিত্তি যে নিতান্তই শিথিল তাহা গোড়া হইতেই পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই অবতরণিকার প্রয়োজন।

৩

আবহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

১৩৪২ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আলিপুর আবহতত্ত্ববিভাগের তৎকালীন প্রধানাধ্যক্ষ ডক্টর এস্. এন্. সেন 'মেঘদূতে আবহতত্ত্ব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। "কালিদাস শুধু ভারতের মহাকবি নন, তিনি একজন প্রধান আবহতত্ত্ববিদ্‌ও ছিলেন"—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি একটি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতঃ 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। বহু স্থলে তাঁহার ব্যাখ্যান সত্যই চমকপ্রদ, এবং 'মেঘদূতে'র রসাস্বাদকে তাহা বহুল-পরিমাণে সমৃদ্ধ করে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু স্বয়ং বৈজ্ঞানিক হইয়াও তিনি গোড়া হইতেই একটি কাল্পনিক অযৌক্তিক ভিত্তির উপর আপন সিদ্ধান্তটিকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, 'পূর্বমেঘ' ও 'উত্তরমেঘ' রূপে মেঘদূতের বিভাগ একেবারেই কল্পনাপ্রসূত; কিন্তু ডক্টর সেন তাহাকেই সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং 'মেঘদূতে'র বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট অভিনব ও কৌতূহলোদ্দীপক মনে হইলেও ইহার বাস্তব ভিত্তি যে নিতান্তই শিথিল, তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। 'পূর্বমেঘ' নামকরণ সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন—

"তিনি [কালিদাস] মেঘদূত কাব্য দুই অংশে ভাগ করিয়াছেন—প্রথম অংশের নাম পূর্বমেঘ; ইহাই বাদলের মেঘ যাহা আজও আর্যাবর্তের উপর দিয়া কোন্ পূর্বদিক হইতে বহিয়া থাকে। এই মেঘকে পথ দেখাইতে গিয়া কবির মন মেঘপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পাঁচ শত ক্রোশব্যাপী পথ অতিক্রম করিয়াছে। পথে পড়িয়াছে কত গিরি নদী জনপদ। অলকায় পৌঁছিয়া যাত্রাশেষে কবি উত্তরমেঘের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। দেখা যায় যে আজও পশ্চিম হিমাচলের উপর এই মেঘ কোন্ উত্তর দিক হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়। অলকা কি তাহা হইলে পূর্ব ও উত্তর মেঘের সন্ধিস্থল এবং এই জন্যই কি কালিদাস মেঘদূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন?"

হায়! যদি সত্যই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ কালিদাস-পরিকল্পিত হইত! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা মল্লিনাথেরই প্রাপ্য। কিন্তু এই মৌলিক সর্বসাধারণ ভ্রমের কথা বাদ দিলেও ডক্টর সেন যেরূপ নিপুণতার সহিত রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত বিস্তৃত মেঘের গতিপথের সহিত বর্তমানকালের বর্ষাকালীন মেঘের গতিপথের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। তিনি বলিয়াছেন—

"অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেড় হাজার বৎসর পূর্বে অন্ততঃ ভারতের পণ্ডিত-মণ্ডলী জানিতেন যে বায়ুর গতির উপর মেঘের চলাচল নির্ভর করে। এসব তথ্য জানিয়া কালিদাস তাঁহার মেঘকে রামগিরি হইতে অলকা পাঠাইতে প্রয়াসী হইলেন। এই প্রস্তাবকে আমরা কি মহাকবির শুধু একটা অলস কল্পনা কিংবা একটা খেয়াল বলিয়া ধরিয়া লইব, অথবা মনে করিব যে মহাকবি আর্যাবর্তে বহুপর্যটনের ফলে নানা মেঘগতি প্রত্যক্ষ দর্শন করেন এবং এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য মেঘদূত কাব্যের অবতারণা করিয়াছিলেন?"

মোটামুটিভাবে, ইহার সহিত আমাদের মতের কোন বিরোধ নাই। সমগ্র ভারতভূখণ্ডের ভৌগোলিক ও তৎসজাতীয় সন্নিবেশ-বৈশিষ্ট্যের সহিত মহাকবির যে অন্তরঙ্গ ও অপরোক্ষ পরিচয় ছিল, ইহা তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিলে প্রত্যেকেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা এ কথা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মানিয়া লইতে পারি না যে, শুধু আবহতত্ত্ব বিষয়ক "অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই মহাকবি মেঘদূত কাব্যের অবতারণা করিয়াছিলেন।" কালিদাস-বর্ণিত মেঘপথের সহিত ১৮ই আগষ্ট ১৯৩৪ তারিখের আবহচিত্রের তুলনাপ্রসঙ্গে ডক্টর সেন যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক—

Scanned by CamScanner

"এখন দেখা যাউক আগষ্ট মাসের কোনো এক নির্দিষ্ট দিনের মেঘপথের সহিত কালিদাসের মেঘপথের কতটা সাদৃশ্য দেখানো যায়। এই উদ্দেশ্যে ১৮ই আগষ্ট ১৯৩৪ তারিখের আবহচিত্র দেখানো হইল। কালিদাসের মেঘপথও এই চিত্রে বসানো হইয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার উপর দিয়া মেঘপ্রবাহের যেসকল রেখা টানা হইয়াছে, উহাদের সঙ্গে কালিদাস-মেঘপথরেখার আশ্চর্য সাদৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ মেঘকে রামগিরি হইতে অলকায় যাইতে হইলে উজ্জয়িনী ঘুরিয়া যাইতে হয় না। এইজন্য মহাকবি 'পূর্বমেঘে'র অষ্টবিংশতি শ্লোকে মেঘকে রাজধানী দর্শনের নানারূপ লোভ দেখাইতে ছাড়েন নাই। বৈজ্ঞানিকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উজ্জয়িনীর পথে পূর্বমেঘকে টানিয়া আনিতে হইলে কোনো বিশেষ কারণের প্রয়োজন হয়। এই কারণ সাধারণতঃ বাদলের ঝড়ের অভিযান। যখন এইরূপ কোনো ঝড় উৎকল হইতে গুর্জর অভিমুখে অগ্রসর হয় তখন রামগিরি অঞ্চলে বর্ষা প্রবল হয় এবং পূর্বমেঘের রামগিরি হইতে উজ্জয়িনী হইয়া অলকা অভিমুখে যাওয়া খুবই সম্ভব হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কালিদাস পূর্বমেঘকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। এই তথ্য কি কাব্যরসের সম্যক্ উপলব্ধির সহায়তা করে না?"

ডক্টর সেনের সহিত আমরাও এক বাক্যে স্বীকার করি যে, এই নূতন তথ্যের জ্ঞান কালিদাসের কবিপ্রতিভার বাস্তবমুখীনতা উপলব্ধি করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক, কিন্তু 'মেঘদূতে' মেঘের গতিপথ যদি নিতান্ত কাল্পনিকই হইত, তবে কাব্যরস-সম্ভোগের দিক দিয়া কিছুমাত্র হানি হইত কি? 'মেঘদূত' এমনই এক কাব্য যাহার সম্পূর্ণ আস্বাদনের পক্ষে বাস্তব সত্যাসত্যত্ববিচার নিতান্তই বহিরঙ্গ ব্যাপার; উহা আপনার অন্তর্নিহিত কাব্যসত্যের উজ্জ্বল প্রভায় চিরভাস্বর। তবে ডক্টর সেন কর্তৃক উদ্ঘাটিত তথ্য বহিরঙ্গ বিচারের পক্ষে সত্যই উপযোগী ও মূল্যবান্, সে বিষয়ে সন্দেহই থাকিতে পারে না। তিনি 'মেঘদূতে'র 'পূর্বমেঘে'র ১৪শ শ্লোকের যে অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখযোগ্য। শ্লোকটি সুপ্রসিদ্ধ—

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥

ডক্টর সেনের মতে "মল্লিনাথ আবহতত্ত্ববিদ্ ছিলেন না এবং এইজন্য এস্থলে

মহাকবির আবহসম্বন্ধে ইঙ্গিত ধরিতে পারা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং তিনি হস্তীশুণ্ডের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমার মনে হয় হস্তীশুণ্ড দ্বারা মহাকবি জলস্তম্ভ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। জলস্তম্ভ যে আমাদের দেশে হাতীশুঁড় নামে পরিচিত ইহা আমরা সকলেই জানি। যাঁহাদের এ বিষয়ে সন্দেহ আছে তাঁহারা জলস্তম্ভের ছবি হইতে বুঝিতে পারিবেন।

"সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মেঘের উত্তরাস্যে অলকার পথে গমনের সময় মাঝেমাঝে জলস্তম্ভের আবর্তে পড়া সম্ভব। এই জন্যই কি কালিদাস পূর্বমেঘকে সতর্ক করিয়াছিলেন?"

দার্শনিক ব্যাখ্যা

রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা'র "গীতে ও বসন্তে" শীর্ষক কবিতায় পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

মেঘদূত লোকে যাহা
কাব্যভ্রমে বলে আহা!
আমি দেখায়েছি তাহা
দর্শনের নবসূত্র।

কিন্তু কৌতুকবশে নহে, সত্যসত্যই গম্ভীরভাবে, 'মেঘদূতের দার্শনিক ব্যাখ্যা' উপস্থাপন করিবার মতো মনীষারও আমাদের দেশে অভাব হয় নাই। ১৩৪৪ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় উল্লিখিত শিরোনামায় ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের সূচনায় প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন—

"এই প্রবন্ধে আমরা মেঘদূত কাব্যের তাৎপর্য হইতে কালিদাসের বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের কথঞ্চিৎ পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিব।"

বেদান্তসম্মতভাবে 'মেঘদূতে'র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভাব বা অনন্তসুখসম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই যেন কালিদাস বেদান্ত মতের অনুসরণ করিয়া এই উভয়ের অভিন্নতা প্রতিপাদনে যুক্ত হইয়াছেন এবং সেই রসস্বরূপ আনন্দময় পরমাত্মাতে যদি জীবাত্মা নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারেন, তবেই উভয়ের চিরন্তন অন্যোন্য তাদাত্ম্য উপলব্ধ হইতে পারে— এই গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বই কবি লৌকিক ব্যবহার স্বীকার করিয়া যক্ষ ও যক্ষিণীর বিরহব্যথা

Scanned by CamScanner

ও উভয়ের মিলনবার্তার বর্ণনা দ্বারা জগতে প্রকাশ করিতে চেষ্টমান হইয়াছেন—আমাদের নিকট এইরূপ ভাব প্রতিভাত হয়।"

তাঁহার এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গিয়া বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্বসমূহের সহিত মেঘদূতে বর্ণিত বিষয়ের যেভাবে সমীকরণ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভ হইতে পাওয়া যাইবে—

"আমার মনে হয়— কালিদাস যক্ষিণীরূপিণী পরমাত্মার সহিত যক্ষরূপী জীবাত্মার ঐকান্তিক চিরমিলনের সম্ভাবনা বর্ণনা করিতে যাইয়া, সঙ্গেসঙ্গে মেঘরূপী জ্ঞানের পথও নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। মেঘ যেমন যক্ষ ও যক্ষপত্নীর মিলনবার্তা বহনে পরম সহায়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্ন-মিলন সংঘটনে জ্ঞানও তেমন পরম সহায়। বেদান্তশাস্ত্রোক্ত 'উত্তরপথ' জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পথ। সেই পথ দিয়া মোক্ষবিদ্যাধিকারী জীবের জ্ঞানরূপ সহচর বহু বিচরণ করে এবং সেই পথ দিয়াই তাঁহাকে লইয়া যাইয়া, সে অবশেষে হর্ষশোকের অতীত পরমাত্মার সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটাইয়া দেয়।... ইহা স্মরণ রাখিয়া কালিদাস সম্ভবতঃ মেঘকে দূত করিয়া পার্থিব যক্ষ ও যক্ষিণীর বিয়োগ ও সংযোগের বার্তা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মের স্বরূপ যে আনন্দময় ও রসময়, ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যেন ব্রহ্মলোকস্বরূপ অলকাপুরীর ও ব্রহ্মস্বরূপিণী অলকানিবাসিনী যক্ষবধূর বর্ণনায় এতটা রসময়ী রচনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, কালিদাস বেদান্তশাস্ত্রে নিহিত আত্মবিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এই ললিতকাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে উত্তরপথে প্রয়াণ দ্বারাই জীবের পক্ষে ব্রহ্মরসের আস্বাদ সম্ভাব্য হয়। তাই বুঝি, যক্ষকে জীবাত্মা, যক্ষপত্নীকে পরমাত্মা ও মেঘের উত্তরদিগ্‌গামী পথকে জ্ঞানের উত্তর-পথরূপে কল্পনা করিয়া কালিদাস নিজেই ব্রহ্মমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি এত বড় বৈদান্তিক!"

বলিতে হয়, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, কালিদাসের 'মেঘদূত' রচনার মূল অভিপ্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে—সংস্কৃত সাহিত্যরসিক পাঠককুল যে মেঘদূত হইতে বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করিতে উন্মুখ হয় না, এই নিতান্ত মোটা কথাটা সহৃদয় পাঠকের এতই অনুভবসিদ্ধ যে, তাহা আর স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। তথাপি ব্যাখ্যাটি অভিনব— সুতরাং প্রাসঙ্গিক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

৫

মেঘদূতের রসিক-ব্যাখ্যা

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় কালিদাস-কাব্য-রসিক মনীষী বিরল। তিনি কালিদাসের কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তত আর কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া জানি না। কিন্তু তাঁহার রচনার একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, কোথাও তাঁহার সমালোচনা পাণ্ডিত্যভারাক্রান্ত নয়। বরং সংস্কৃতসাহিত্যে ঐরূপ একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিতের লেখনী হইতে ঐ প্রকার লঘু অথচ সরস রচনা কিরূপে বাহির হইল, তাহা আমাদের কাছে পরমবিস্ময়স্থল বলিয়া মনে হয়।

শাস্ত্রিমহাশয় একাধিক প্রবন্ধে 'মেঘদূতে'র সৌন্দর্য ও কবিত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন,[১] কিন্তু সবগুলিতেই এমনই একটি প্রসন্ন পরিহাসরসিকতা বিরাজিত আছে যে, অনেক সময় পাঠকের বুঝিবার অবসরই হয় না যে, সেই আপাতচটুলতার অন্তরালে কতখানি মননশীলতা ও বিশুদ্ধ সাহিত্যসৌন্দর্যবোধ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ১৩০৯ সালে প্রকাশিত 'মেঘদূত' নামক পুস্তিকার বিজ্ঞাপনে শাস্ত্রিমহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কালিদাসের কাব্যব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রিমহাশয় কি অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন—

"হিমালয়ের যেমন পাঁচটি চূড়া— গৌরীশঙ্কর কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলাগিরি মুক্তিনাথ ও গোসাইথান, সংস্কৃত সাহিত্যেও তেমনি রঘুবংশ উত্তরচরিত শকুন্তলা মেঘদূত ও কুমারসম্ভব অতি উচ্চ, অতি গম্ভীর, অতি শোভাময়, অতি পরিষ্কার ও অতি রমণীয়।

"পাঁচখানি কাব্যেরই অনেক ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা কিন্তু অধিকাংশই সংস্কৃত বুঝাইবার জন্য। ভাব বুঝানো কোনো কোনো ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হইলেও সৌন্দর্য বুঝানো কোনো ব্যাখ্যারই উদ্দেশ্য নহে; অথচ কাব্যগুলি সৌন্দর্যের খনি, ছোটখাট খনি নয়, একেবারে জোহানেসবর্গ। এই সৌন্দর্যের কিছু কিছু বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করি, অনেকদিন ধরিয়া ইচ্ছা ছিল। এজন্য ত্রিশ বছর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম। প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি; ক্রমেই ইহাদের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে। দৃষ্টির মণ্ডল যতই বাড়িতেছে, সৌন্দর্যের চমৎকারিতাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। তাই মনে করিয়াছিলাম, সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা কিছু লিখিয়া রাখা আবশ্যক, সেই জন্যই

Scanned by CamScanner

সকলের ছোট যে মেঘদূত, তাহারই ব্যাখ্যায় প্রথম প্রবৃত্ত হই। প্রবৃত্ত হইয়াই দেখি, মেঘদূত সর্বাপেক্ষা কঠিন কাব্য, উহাতে প্রাচীন ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্বের অনেক জটিল কথা আছে। সেগুলি একরূপ মীমাংসা করিয়া লইলাম। লেখা শেষ হইল। ছাপানোর ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং ইচ্ছামত লিখিলাম।"[৭]

কিন্তু একটি বিষয়ে শাস্ত্রিমহাশয়ের খটকা লাগিল, তাহা রুচির প্রশ্ন লইয়া। শাস্ত্রিমহাশয়ের নিজের কথাতেই ঐ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য উল্লেখ করি—

"কিন্তু এক কথায় বড় ঠেকিয়া গেলাম। সৌন্দর্যের মুখে রুচির উপর বড় একটা ঝোঁক থাকে না। রুচি দেশ কাল পাত্র অনুসারে বদলায়, সৌন্দর্য বদলায় না। এখন যাহা কুরুচি, কালিদাসের সময়ে তাহা কুরুচি ছিল না। আমি ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি, আমাকে কালিদাসের বশেই যাইতে হইল। অনেক জিনিস এখনকার রুচিসংগত হইবে না, বেশ বোধ হইল···।"[৮]

এক্ষণে 'মেঘদূত' পুস্তিকা হইতে দুই-একটি স্থল উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—তাহা হইতে কি দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া শাস্ত্রিমহাশয় 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন মিলিবে। 'মেঘদূতে'র প্রথম শ্লোকেই কালিদাস কুবের শাপে অস্তংগমিতমহিমা নির্বাসিত যক্ষের যে অবতারণা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রিমহাশয়ের ব্যাখ্যা শোনা যাউক—

"কুবেরের সরকারে সে একটি চাকরী করিত, খুব বড় গোছের চাকরী বলিয়া বোধ হয় না; কেননা, কাজে অবহেলা করে বলিয়া কুবের তাহাকে শাস্তি দিয়াছেন। সলসবরি, চেম্বারলেন হইলে পারিতেন কি? তবে নিতান্ত ছোট চাকরীও নহে, কারণ, কুবেরের দৃষ্টি তাহার উপর ছিল; এবং কুবের কিছু রাগিয়াই শাস্তি দিয়াছিলেন। তাহাতেই বোধ হয়, তিনি জুনিয়ারদের মধ্যে একজন। বেশ রাইজিং ও প্রমিসিং অফিসর ছিলেন। কিন্তু কুবের এত রাগ করেন কেন? যেহেতু সেই যক্ষটি বড় কাজে অবহেলা করিত। কেন করিত, কালিদাস লেখেন নাই। কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারি। পয়সা-কড়ি যেমন হোক কিছু ছিল: বয়স তো যক্ষদের যৌবন ছাড়া ছিলই না। তাহার উপর এ বেচারার বয়স কম; বৌটিও সুন্দরী; বেচারা তাহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। মনে করিত, বুঝি পদ্ম-শঙ্খেরও উপর কোনো অমূল্য নিধি পাইয়াছি। একটু আসিতে দেরী হইত; কাজে ভুল হইত; প্রথম প্রথম হয়তো কুবের টুকিয়াছিলেন; তারপর ধমকও দিয়াছিলেন; তাহার পর যখন দেখিলেন রোগ অসাধ্য, তখন তাহার প্রতীকার আবশ্যক হইল। অপরাধ তো সাব্যস্তই আছে। কি শাস্তি দেওয়া যায়? যক্ষ-পিনাল-কোডে

হুইপিং নাই, কারাবাস নাই, ফাইন নাই, আছে কেবল বিরহ। কুবের সেই সাজাই দিলেন। বিরহ, এক বৎসর। উত্থান-একাদশীর পরদিন যক্ষ বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে অলকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এক বৎসরের জন্য বাহির হইল। কুবের দেখিলেন এ ছোঁড়া যেরকম পাগলা, লুকিয়ে চুরিয়ে আসিতে পারে। তাই বাহির হইবার সময় তাহার যত মহিমা ছিল, সব কাড়িয়া লইলেন। সে যে তার দেবযোনির ন্যায় অণু হইয়া লঘু হইয়া, চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আবার তাহার স্ত্রীর কাছে আসিবে বা তাহার সঙ্গে দেখাশুনা করিবে, কুবের সে পথ মারিয়া দিলেন। এখন সে বেচারা যায় কোথায়? ভারতবর্ষের যাবতীয় স্থান বিবেচনা করিয়া দেখা হইল। বড় লোকালয়ে পাঠাইলে যক্ষ পাছে বেণেদের সঙ্গে ভুটিয়া ব্যবসায় কাঁদিয়া বসে। কাশী কেদারনাথ প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলে যক্ষ পাছে ধর্মে কর্মে মন দেয়। তাই দুষ্ট বুড়া কুবের মিচকি মিচকি হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, সে রামগিরিতে থাকিবে। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে কয়েক বৎসর রামগিরিতে বাস করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তথায় তাঁহার একটি আশ্রমের কুটীর ভাঙিলে তিনি আর-এক আশ্রমে কুটীর নির্মাণ করিতেন। যেখানে জল পাইতেন, সেইখানেই জল-ক্রীড়া করিতেন; সীতা সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। কুবের বলিয়া দিলেন, তুমি রামায়ণ পড়িয়াছ, তুমি রামগিরিতে থাক গিয়া। মনে মনে ভাবিলেন, যেমন দুষ্ট; সমস্ত দিন স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন— খুব হয়েছে, এক বৎসরে একটু বিলক্ষণ জ্ঞান-যোগ হইবে। বিরহের সময়ে রামসীতার মিলনের স্মৃতি উহার বিরহ-বেদনাটা খুব তীব্র করিয়া দিবে।"[৯]

'পূর্বমেঘে'র ১৯শ শ্লোকে যেখানে বিন্ধ্যপাদপ্রবাহিণী রেবার বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাস বলিয়াছেন—

রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য।

তাহার ব্যাখ্যায় শাস্ত্রিমহাশয় বলিতেছেন—

"শীঘ্র শীঘ্র খানিক দূর গিয়া দেখিবে নর্মদা নদী। মনের উৎকট আবেগে রোগা হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।[১০] কি উৎকট অবস্থা! বিন্ধ্যের পা গুলা কি যেমন তেমন পা, পাহাড়ে, পাথরে, ডেলায়, ডুমরিতে এবড় খেবড়। যেন কোনো গোদা মিন্সের পায়ে ধরিয়া নর্মদা আছুথালুভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। নিম্নে স্বচ্ছসলিলা বিস্তীর্ণা নর্মদা, উপরে কূর্মপৃষ্ঠবৎ অবস্থিত বনরাজি-বিরাজিত বিন্ধ্যপর্বত। মাঝে মাঝে সাদা ঝরনা পর্বতপৃষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া

Scanned by CamScanner

নর্মদায় পড়িতেছে, উপর হইতে বোধ হইতেছে, যেন একটা হাতীর শিঙার হইয়াছে। বড় বড় সাদা সাদা লাল লাল কালো কালো ডোরা-দেওয়া হাতীর শিঙার যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই এ উপমার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।"[১১]

দশার্ণের রাজধানী বিদিশার উপকণ্ঠে 'নীচৈঃ' নামে একটি পাহাড়—যক্ষ মেঘকে বিশ্রামের জন্য সেই পাহাড়ে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়া বলিতেছে—

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রান্তিহেতোঃ—

এই শ্লোকের শাস্ত্রিমহাশয়ের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিব কি?—

"সেখানে গিয়া তুমি নীচৈ নামে সহরতলীর পাহাড়ে বাসা লইয়ো। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর পুলকে পূরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে, তাহার পুলক কদম্ব ফুলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়টি কূর্মপৃষ্ঠ, ৩০০।৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। উহা বৌদ্ধ বিহার বৌদ্ধ স্তূপ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে এককালে মণ্ডিত ছিল, আর স্থানে স্থানে পাথর দিয়া গাঁথা এক-একটা খালি ঘর নির্জনে পড়িয়া থাকিত। এরূপ নগরের বাহিরে নির্জন ঘর দেখিতে চাও, হিমালয়ের সর্বত্র দেখিতে পাইবে। ও ঘরে কি হয়?—এমন কিছু নয়—একটা ঢেটরা হয়। কিসের ঢেটরা—এই কথা যে নগরবাসীদের যৌবন-দড়ি ছেঁড়ে—স্মৃতির লাগামে, ধর্মের বন্ধনে, উপদেশের নাগপাশে, আর বাঁধা থাকে না। মিথ্যা কথা; নির্জন ঘর ঢেটরা দিতেছে—সৎপ্রতিপক্ষ বাক্য—(contradiction in terms)। দূর মূর্খ, দেখিতেছিস না—নাক কি নাই? ও কিসের গন্ধ? ও যে পরিমল—চটকান ফুলের গন্ধ; ঐ ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে—বুঝিতেছিস না কে ঐ ফুল চটকাইল—কখন্ চটকাইল, কেমন করিয়া চটকাইল—যদি না বুঝিয়া থাকিস, যা—তোর মেঘদূত পড়িতে হইবে না।"[১২]

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে শাস্ত্রিমহাশয়ের 'মেঘদূত' ব্যাখ্যার শৈলীর কিছু নিদর্শন মিলিবে। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, সৌন্দর্য বুঝাইতে গিয়া তিনি শিক্ষিত সমাজের শালীনতাবোধকে বেশ কিছুটা উপেক্ষা করিয়াছেন, ইচ্ছাপূর্বকই করিয়াছেন; কেননা, মেঘদূতের কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব বুঝিতে হইলে ঐ প্রকার নগ্নবিশ্লেষণ ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবপর নয়। তবে কালিদাসের পক্ষে একটু সুবিধা ছিল এই যে, তিনি দেবভাষার মাধ্যমে শিল্পকর্মকে রূপ দিয়াছেন এবং দেবভাষার এমনই এক অলৌকিক শক্তি আছে, যাহাতে আপাত অশ্লীল ভাবরাজিও অপূর্ব সুষমা ও লালিত্যে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু শাস্ত্রি-

মহাশয়কে অসাধ্যসাধন করিতে হইয়াছে, সেই অপরূপ শিল্পকর্মকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সৌন্দর্য সাধারণের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে হইয়াছে বঙ্গভাষার মাধ্যমে। শাস্ত্রিমহাশয় যে বলিয়াছিলেন—

"সংস্কৃত কাব্যের বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা নূতন। ভাষা ছাড়িয়া, ব্যাকরণ ছাড়িয়া, অলংকার ছাড়িয়া, শুদ্ধ সৌন্দর্য বুঝাইতে গিয়া ভূগোল ইতিহাস পুরাতত্ত্ব স্বভাব নরচরিত প্রভৃতির কথা তোলা নূতন। এত নূতন করিতে গিয়া যদি ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে পাঠকবর্গ মার্জনা করিবেন। প্রথম পথিকের ভুল-ভ্রান্তি অনিবার্য।"[১৩]

তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সৌন্দর্যের এই নবীন ব্যাখ্যান-শৈলী প্রবর্তন করিতে গিয়া তিনি যে সভ্য বিদগ্ধ সমাজের প্রচলিত শালীনতাবোধের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হন নাই, সেজন্য তাৎকালিক বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর নিকট তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছিল—শাস্ত্রিমহাশয়ের সাহিত্যজীবনে তাহা এক বেদনাকর অধ্যায়।[১৪]

শাস্ত্রিমহাশয়কৃত মেঘদূতের সৌন্দর্য-ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি বুদ্ধিকৃত বিশ্লেষণ। শাস্ত্রিমহাশয়ের রসানুভূতিক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও, বিশ্লেষণ-প্রতিভাই ছিল তাঁহার মনীষার প্রধান লক্ষণ। সেই অক্লান্ত গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণী বুদ্ধি তাঁহাকে যতদূর লইয়া গিয়াছে, তিনি ততদূর গিয়াছেন। শ্লীলতা-অশ্লীলতার সংকীর্ণ গণ্ডী তাঁহার বিশ্লেষণী বুদ্ধির গতিপথকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। বুদ্ধির সহিত সাহিত্যিক কল্পনার মিশ্রণ ঘটিলেও, শাস্ত্রিমহাশয়ের ক্ষেত্রে বুদ্ধিই ছিল নিয়ন্ত্রী শক্তি। তাই তাঁহার রচনা রসঘন হইলেও বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর।

উদ্ধৃত সন্দর্ভাংশগুলিতে মনীষার সহিত রসদৃষ্টির যে সমন্বয় হইয়াছে, শাস্ত্রি-মহাশয়ের কালিদাস কাব্যসমালোচনার অধিকাংশ স্থলেই তাহা পাঠকের দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। কালিদাসের কবিকল্পনার মূল প্রেরণাকে বুঝিবার ও সর্বজনবোধ্যভাবে তাহাকে সাধারণ পাঠকসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার এইরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রয়াস দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজীবন কালিদাসের কাব্যের অনুশীলন করিয়াও যেন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৮২ খৃঃ 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় শাস্ত্রিমহাশয় 'মেঘদূতে'র যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে, তাহাই তাঁহার নিজের কাছে অপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে; তাই দ্বিতীয়বার 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার উপক্রমে তিনি বলিয়াছেন—

Scanned by CamScanner

"অদ্য মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিব। বিশ বছর পূর্বে, একবার বঙ্গদর্শনে এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম।[১৫] পড়িয়া দেখিলাম, মনোমত হইল না— ফিকে লাগিল। তখন পূর্বমেঘ কালিদাসের ভৌগোলিক বিবরণ-লেখকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এখন সেরূপ করিতে ভরসা হয় না। করিলে মনে হয়, কালিদাসের আদর করিতে শিখি নাই। পূর্বমেঘ মেঘদূতের অর্ধেক, তাই যদি ছাড়িয়াছিলাম তবে ব্যাখ্যা করিয়াছি কি ছাই? উত্তরমেঘেও অনেক স্থান ভাসা ভাসা ছিল, অনেক স্থানের সৌন্দর্যবোধই হয় নাই। তাই আবার একবার নূতন করিয়া ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব।"[১৬]

'মেঘদূতে'র সৌন্দর্যে, 'মেঘদূতে'র রসসংবেদনে শাস্ত্রিমহাশয় যেন বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলেন! অলংকার-শাস্ত্রের বিধান অনুসারে 'মেঘদূত' 'খণ্ডকাব্য' রূপে পরিচিত। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয় ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধার করিয়াই এ প্রসঙ্গ সমাপন করিব—

"মেঘদূতকে অলংকার-শাস্ত্রে খণ্ডকাব্য বলে; ইংরেজরা লিরিক বলেন। কোনটি সত্য? খণ্ডকাব্য— অর্থ যতদূর বুঝা যায়— টুকরা কাব্য বলিয়াই বোধ হয়, টুকরা কাব্য বলিয়া মেঘদূতের উল্লেখ করিলে জিনিসটার অবমান করা হয়। মেঘদূত টুকরা নহে— পুরা, সর্বাঙ্গে সুশোভিত, সম্পূর্ণ, এবং অপ্রমেয়। সুতরাং মেঘদূত টুকরা নহে। ছোটকাব্য বলিতে চাও বল। দৈর্ঘ্যে ছোট, কিন্তু ফলে ছোট নয়। কিন্তু খণ্ড বলিতে তো ছোট বুঝায় না।.. তবে যদি কেহ বলে, খণ্ড শব্দের অর্থ খাঁড় গুড়,— তখনকার প্রধান মিষ্ট সামগ্রী। আমাদের রাতাবী মনোহরা। তন্ময়কাব্য খণ্ডকাব্য। তাহা হইলে কতক রাজী আছি। সেকালে খণ্ড শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নৈষধকার খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। আমরা এখন যেমন বলি অমিয়-নিমাই-চরিত! তেমনি সেকালে খণ্ডকাব্য অর্থে মধুময় অমৃতময় কাব্য। টুকরা ফুকরা বলিলে জমে না।"[১৭]

Scanned by CamScanner